মানব পাচার

খোন্দকার মাহ্‌ফুজুল হক

ফেসবুকে ইতালির একটি গ্রুপের সদস্য হয় মাদারীপুর জেলার একজন বাসিন্দা। তিনি বাংলাদেশ থেকে লিবিয়া হয়ে ইতালি যেতে চান। ফেসবুকে তাকে জানানো হয় স্থানীয় এক ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে। যথাসময়ে তিনি ওই ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করেন। ওই ব্যক্তির কথার আলোকে ইতালি যাওয়া বাবদ তিনি তাকে ছয় লাখ টাকা দিয়ে দেন। এক পর্যায়ে তিনি ইতালি যাওয়ার পথে লিবিয়ার ত্রিপোলিতে পৌঁছান। ত্রিপলিতে পৌঁছানোর পর সেখানকার একটি গ্রুপ তাকে বন্দি করে মুক্তিপণ দাবি করে। পরবর্তীতে তার পরিবার আরো পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ পাঠিয়ে তাকে ত্রিপলি থেকে দেশে ফেরত আনে। ২০১৯ সালের এ ঘটনা তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হয়।

মানব পাচার একটি ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক ঘটনা। যার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। মানব পাচারকারীরা প্রতারণামূলক পাসপোর্ট বা ভিসা দিয়ে অভিবাসীদের পাচার করে থাকে। জোরপূর্বক শ্রম, যৌন শোষণ বা ক্রিয়াকলাপ, অঙ্গ অপসারণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সাধারণত মানব পাচার করা হয়।

অভিবাসন নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ফ্রন্টিয়ার'র ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে ঢোকার চেষ্টায় আটক হওয়া মানুষের মধ্যে বাংলাদেশিরা তৃতীয়। যার সংখ্যা হলো প্রায় ৭ হাজার ৫ শত ৭৭ জন। আন্তর্জাতিক যৌন শিল্পে নিয়োগ, পতিতাবৃত্তি, পর্নোগ্রাফি, চাইল্ড সেক্স রিং এবং যৌন সম্পর্কিত পেশা যেমন নগ্ন নাচ এবং মডেলিং ইত্যাদি মানব পাচারের দ্বারা ক্রমবর্ধমান একটি ব্যবসা হিসেবে এ সেক্টরের উদ্যোক্তাদের কাছে লোভনীয় ব্যবসারূপে পরিচিত। মানব পাচারের সাথে জড়িত সাম্প্রতিক এবং অত্যন্ত বিতর্কিত ঘটনা হলো অপহরণ বা প্রতারণা। যার ফলস্বরূপ শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একজন ব্যক্তি থেকে অপসারণ করা হয় অন্য মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপনের জন্য। এছাড়াও পাচারকৃত শিশুদের দ্বারা পতিতাবৃত্তি, চুরি, ভিক্ষা এবং মাদক পাচার করা হয়ে থাকে। উটের জকি, গৃহকর্ম ইত্যাদিতেও পাচারকৃত শিশুদের ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও গার্হস্থ্য দাসত্ব, বিনোদন, যৌন শিল্পী, পতিতাবৃত্তি, চুরি, ভিক্ষা, মাদক ব্যবসার জন্য শিশুদেরকে পাচার করা হয়ে থাকে।

মানব পাচার অপহরণ বা জোরপূর্বক হতে পারে। কিন্তু অনেকেই মিথ্যা চাকরির প্রলোভন, উন্নত আয় ও উন্নত বসবাস প্রাপ্তির আশায়ও পাচারের শিকার হতে দেখা যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে ভালো চাকরি এবং নারী, শিশু-কিশোরীদের পাচারের ক্ষেত্রে ভালো চাকরি, নায়িকা বা মডেল বানানোর লোভ দেখানো হয়ে থাকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে ফাঁদ পেতেও ইদানীং মানব পাচার হচ্ছে। ফেসবুক, টিকটক, ইমো, হোয়াটস্‌অ্যাপ ইত্যাদির মাধ্যমে অনেককে পাচারকারীরা তাদের শিকারের ফাঁদে ফেলে পাচার করছে বলে বর্তমানে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রায়শই পাওয়া যায়।

মানব পাচারের অনেকগুলো কারণে মধ্যে ধর্মীয় নিপীড়ন, রাজনৈতিক বিভেদ ও পটপরিবর্তন, কর্মসংস্থানের অভাব, দারিদ্র্য, যুদ্ধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যতম। এছাড়া বিশ্বায়নের প্রভাবকেও মানব পাচারের ক্রমবৃদ্ধির কারণ হিসেবে বর্তমানে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

মানব পাচারের রুট হিসেবে পাচারকারীরা প্রায়ই পাচার কাজের জন্য আন্তর্দেশীয় রুট তৈরি করে। যার আদি রুট হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ এবং সাহারান আফ্রিকা। ভূমধ্যসাগরের মধ্যাঞ্চল বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক পাচার রুটগুলোর একটি হিসেবে পরিচিত।

জাতিসংঘের অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা আইওএম এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সব এলাকার বাসিন্দারাই মানব পাচারের শিকার হয়। তবে ঢাকা, খুলনা এবং সিলেট অঞ্চলের মানুষ বেশি পাচার হয়। জেলা হিসেবে মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, শরীয়তপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং হবিগঞ্জ থেকে সবচেয়ে বেশি মানব পাচারের ঘটনা ঘটে। এসব জেলা থেকে প্রতি লাখে দেড় জনের বেশি মানুষ পাচারের শিকার হয়। যেসব এলাকার সাথে ভারতের সীমান্ত বেশি সেসব এলাকার বাসিন্দারাই বেশি মানব প্রচারের শিকার হচ্ছে মর্মে আইওএম "ট্রাফিকিং ইন পারসন ইন বাংলাদেশ" নামক প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে। প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে ২০২০ সালে বাংলাদেশ থেকে মোট ৭৩০টি, ২০১৭ সালে ৭৭৮ টি এবং ২০১৮ সালে ৫৬১ টি মানব পাচারের ঘটনা জানা গেছে। এছাড়াও অন্য কাজের তুলনায় এ কাজে বেশি অর্থ আয় সম্ভব হয় বলে অন্য কাজের চেয়ে এই কাজে একটি অংশ জড়িত

হচ্ছে। প্রতিটি মানব পাচারে ৫০ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত পাচারকারীরা আয় করে থাকে বলে প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের টেকনাফ হয়ে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে অবৈধ প্রবেশের একটি রুট প্রায়ই ব্যবহার করছে পাচারকারীরা। পরিসংখ্যান বলছে, এই রুটে প্রতিবছর ঝুঁকিপূর্ণভাবে সাগরপথে প্রায় ৫০ হাজার লোক মালয়েশিয়ায় পাচার হয়। এছাড়াও কাউকে আবার থাইল্যান্ডের গহীন জঙ্গালে আটকে রাখার পর ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনাও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। রোহিঙ্গাদের মাঝ থেকে বিশাল একটি অংশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানব পাচারকারীরা উন্নত জীবন লাভের আশায় পাচার করছে। অভিবাসন সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর গড়ে পাঁচ হাজার মানুষ বাংলাদেশ থেকে উন্নত জীবন লাভের আশায় বিভিন্ন দেশে যাওয়ার চেষ্টা করছে যাদের অধিকাংশই পাচারের ফাঁদে পড়ছে। ইউরোপীয় কমিশনের তথ্য অনুযায়ী গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে প্রবেশ করেছে ৬৫ হাজারের বেশি মানুষ। যাদের অনেকেই নিজের অজান্তে মানব পাচারের শিকার হয়েছেন।

মানব পাচার অত্যন্ত সুগঠিত ও সংগঠিত অপরাধমূলক কর্মকান্ড হলেও মানব পাচার রোধের জন্য ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমন্বিত কোন প্রচেষ্টা আবির্ভূত হয়নি। প্রাথমিকভাবে স্টেকহোল্ডারকে মানব পাচার একটি সমস্যা এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মার্কিন কংগ্রেস প্রথম ফেডারেল আইন পাস করে মানব পাচারকে মোকাবেলা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এজন্য তারা "ভিকটিমস অব ট্রাফিকিং অ্যান্ড ভায়োলেন্স প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০০০ (টিভিপিএ)" নামে একটি আইন পাস করে। যার প্রাথমিক লক্ষ হচ্ছে প্রচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা এবং সহায়তা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া উৎসাহিত করা। পাশাপাশি বিদেশি দেশগুলোকে পাচারবিরোধী কর্মসূচি এবং আইন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা।

টিভিপিএ নামে এ আইনটির আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে বিচার বিভাগ, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি, হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিসেস এবং লেবার, ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টসহ অনেক ফেডারেল সংস্থাকে মানব পাচারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২০০০ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিল বিশেষ করে নারী ও শিশুদের পাচার প্রতিরোধ দমন এবং শাস্তি দেওয়ার প্রটোকল যা মানব পাচারের একটি সাধারণভাবে স্বীকৃত কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদান করেছিল। জাতিসংঘের 'ড্রাগস এন্ড ক্রাইম' অফিসটি মানব পাচার সংক্রান্ত নীতি নিরীক্ষণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে এবং মানব পাচারের বিরুদ্ধে গ্লোবাল প্রোগ্রামের ডিজাইনার (জিপিএটি)। পরবর্তীতে বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন মানব পাচারের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে শুরু করে।

বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন নামে একটি শক্তিশালী আইন প্রণয়ন করে। এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও দ্রুত বিচারের জন্য 'মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' প্রতিটি জেলায় গঠন করে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সাথে বাংলাদেশ সরকার মানব পাচার রোধে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। কেননা সীমান্তবর্তী জেলাগুলো থেকে সাধারণত ভারত হয়ে মানব পাচার বেশি হয়ে থাকে।

এছাড়াও মানব পাচার রোধে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে। 'পালেরোমা চুক্তি' নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রটোকল প্রণয়ন করা হয়। ১৩৩ টি দেশ সেই প্রটোকলের স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। "দ্য গ্লোবাল অ্যাকশন অ্যাগেইনস্ট ট্রাফিকিং ইন পারসন এন্ড স্মাগলিং মাইগ্রান্টস বাংলাদেশ" প্রকল্পের অধীনে ইউএনওডিসি এবং আইওএম এর সমন্বয়ে বাংলাদেশ মানব পাচার রোধে কাজ করে যাচ্ছে। এর উদ্যোগে বাংলাদেশে একটি সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এছাড়াও অনলাইনে মানব পাচার বিরোধী প্রচার প্রচারণা এবং সাইবার ক্রাইম এর মাধ্যমে মানব পাচারের মতো বিষয়গুলো প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পাশাপাশি প্রযুক্তির ব্যবহার করে মানব পাচারকারীদের শনাক্ত, তদন্ত এবং বিচারকার্যের আওতায় আনার জন্য বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শুধু ভারতে পাচার হওয়া ২০০০ নারীকে গত দশ বছরে বাংলাদেশ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও লিবিয়াসহ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশ পাচারকৃত লোকদেরকেও ফিরিয়ে আনছে।

মানব পাচার একটি বৈশ্বিক সমস্যা হলেও বাংলাদেশে এ চক্রটি খুবই সক্রিয়। বাংলাদেশের মানুষদেরকে তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করে এবং প্রেমের প্রলোভন ও উন্নত জীবন যাপনের প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে পাচার করাটা অনেক সহজ। এজন্য পাচারকারী ও দালালদের পরিচয় জানার পর তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া, বিশেষ করে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা এবং যথাসম্ভব বিচার করে আইনের শাসন নিশ্চিত করা গেলে পাচারকারীরা হয়তো কিছুটা থামবে। এর পাশাপাশি জনসচেতনতা তৈরি করতে পারলেই কার্যকর নিয়ন্ত্রণের দিকে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

#

লেখক : প্রাবন্ধিক, গল্পকার ও কথাসাহিত্যিক।

পিআইডি ফিচার